بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বদরের যুদ্ধের অনতিপর মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত দু'টি ঘটনা এবং ইসরাঈল-ফিলিস্তিনের যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

তাশাহহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বদরের যুদ্ধের অনতিপর মহানবী (সা.)-এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝে একটি আলোচিত ঘটনা হলো, মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র বিয়ের ঘটনা। বর্ণিত হয়েছে, হযরত খাদিজা (রা.)'র মৃত্যুর পর একদিন হযরত খওলা বিনতে হাকীম (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনি কি বিয়ে করতে চান না? মহানবী (সা.) বলেন, কার সাথে? হযরত খওলা বলেন, আপনি কুমারী বা বিধবা যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারেন। তিনি (সা.) পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করেন, কুমারী কে আর বিধবা কে? তাকে বলা হয়, কুমারী হলো আয়েশা বিনতে আবু বকর। আর বিধবা হলো সওদা বিনতে জামআ। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তাদের অভিভাবকদের সাথে গিয়ে কথা বলো। অনুমতি পেয়ে খওলা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও তাঁর স্ত্রী উম্মে রোমানের বাড়িতে গিয়ে সুসংবাদস্বরূপ বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে কত মহান কল্যাণ দান করেছেন! তারা জিজ্ঞেস কপান, কি সেই কল্যাণ? উত্তরে খওলা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আয়েশার সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রস্তাবের কথা শুনে বলেন, আয়েশার সাথে কি তাঁর বিয়ে বৈধ হবে? কেননা সে তো তাঁর (সা.) ভাইয়ের কন্যা। এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার ইসলামের ভাই (রক্তের ভাই নও)। তোমার মেয়ের সাথে আমার বিয়েতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নাই। এদিকে মুতইম বিন আদী আবু বকর (রা.)-কে তার পুত্রের বিয়ের জন্য আয়েশার কথা বলেছিল। তাই হযরত আবু বকর (রা.) মুতইম বিন আদীর বাড়িতে গেলে সে এবং তার স্ত্রী বলে, আমরা যে ধর্মের অনুসারী সেই ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে আমরা আমাদের পুত্রকে তোমার মেয়েকে বিয়ে করাবো। হযরত আবু বকর (রা.) বিষয়টি অস্বীকার করেন আর মহানবী (সা.)-কে নিজের সম্মতির কথা জানালে তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বিয়ের পর বলেন, দিব্যদর্শনে দু'বার আমাকে তোমার চেহারা দেখানো হয়েছে। একবার দেখি, এক ফিরিশ্তা এক টুকরো রেশম কাপড়ে তোমাকে বহন করে আছেন। আরেক স্বপ্নে দেখি, হযরত জীব্রাঈল (আ.) একটি কাঁচের টুকরো এনে বলেন, ইনি আপনার সহধর্মিনী। আমি তাকে বললাম, কাপড় সরাও। কাপড় সরালে দেখি যে, সেখানে তুমি। তখন আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটি নির্ধারিত হয়ে থাকলে তিনিই একে বাস্তবায়িত করবেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, সাহাবীদের জীবনসম্বলিত পুস্তক আল্ ইস্তিয়াবে হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আয়েশাকে উঠিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তিনি (সা.) বলেন, মোহরানা দিতে না পারার কারণে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সাড়ে বারো উকিয়া (এক উকিয়া সমান চল্লিশ দেরহাম) দেন যা তিনি (সা.) মোহরানা হিসেবে প্রদান করে হযরত আয়েশা (রা.)-কে উঠিয়ে নেন।

বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স নিয়ে ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারকদের মাঝে বিভিন্ন মত ও বক্তব্য পাওয়া যায় আর অমুসলিম সমালোচকরা এটি নিয়ে অনেক আপত্তি করে থাকে। **প্রথম নীতিগত বিষয় হলো,** হযরত আয়েশা (রা.)'র যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স নিয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। যদি তাঁর বয়স আপত্তিকর হতো তাহলে মুনাফিক বা বিরোধীরা অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করত, কিন্তু তৎকালীন কোনো ইতিহাসগ্রন্থে এরূপ আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে এ যুগের হাকাম ও আদল **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,** বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র নয় বছর হওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন বা কোনো হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। **হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন,** হযরত খাদিজা (রা.)'র মৃত্যুর পর যখন হযরত আয়েশা (রা.)'র বিয়ে হয়েছিল তখন নবুয়্যতের দশম বছরের শওয়াল মাস ছিল। প্রথমত, হযরত আয়েশা (রা.) তখন প্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন, নতুবা খওলা (রা.) তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতেন না। এছাড়া যদি ধরে নেয়া হয় যে তিনি তখনও প্রাপ্তবয়স্কা হননি এটিও জানা উচিত যে, তখন কেবল তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাকে নেয়া হয়নি। এরপর হিজরতের দ্বিতীয় বছর বিয়ের পাঁচ বছর পর যখন তাঁর বয়স ১২বছর হয় তখন মহানবী (সা.) তাঁকে উঠিয়ে নেন।

তিনি (রা.) **হযরত আয়েশা (রা.)'র গুণাবলী** বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) প্রখর ধীশক্তি সম্পন্না ছিলেন। তাঁকে স্বল্প বয়সে বিয়ে করার পেছনে মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি মুসলমান নারীদের তরবীয়ত করতে পারেন। তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর সাহচর্যে থেকে যেন সেই মহান কার্য সম্পাদন করতে পারেন যা একজন শরীয়তবাহী নবীর স্ত্রীর প্রতি অর্পণ করা হয়। কাজেই, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সঠিক তরবীয়তপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমান নারীদের তা'লীম-তরবীয়তের ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখেছেন ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। এছাড়া হাদীসের এক বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হযরত আয়েশা (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এত বেশি ছিল যে, বড় বড় সাহাবীরা তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয় জানতে আলোচনা করেন। একবার মহানবী (সা.) বলেন, **পুরুষদের মধ্যে অনেক লোক পূর্ণাঙ্গীন জ্ঞানার্জন করেছে, কিন্তু নারীদের মাঝে এ সংখ্যাটি অনেক কম যেমন আসিয়া, মরিয়ম। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগে অন্যান্য নারীর চেয়ে আয়েশার সেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যেমনটি আরবের অন্যান্য স্থানের তুলনায় সরীদ (এক প্রকার খাবার)'র শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।** একবার আয়েশা (রা.)

সম্পর্কে কেউ কিছু বললে মহানবী (সা.) বলেন, কোনো স্ত্রীর ঘরে থাকাকালীন আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) ’র ঘরে থাকাকালীন আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।

মহানবী (সা.)-এর জীবনের আরেকটি ঘটনা যা বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পর সংঘটিত হয়েছিল তা হলো হযরত **যয়নব (রা.) ’র ঘটনা**। তার স্বামী আবুল আস বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। যয়নব তখনো পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন। তিনি স্বামীকে মুক্ত করতে মক্কা থেকে একটি গলার হার মুক্তিপণস্বরূপ প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে খুবই কষ্ট পান এবং সাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা যথার্থ মনে করলে যয়নবের স্বামীকে মুক্ত করে দাও, কিন্তু এর বিনিময়ে তার হারটি রেখো না; কেননা এটি হযরত খাদিজার হার। এরপর সাহাবীরা তদ্রুপই করেন। মহানবী (সা.) তাকে এ শর্তে মুক্ত করে দেন যে, তুমি মক্কায় গিয়ে যয়নবকে মদীনায় আসতে দিবে। এরপর আবুল আস মক্কায় গিয়ে যয়নবকে মদীনায় আসার অনুমতি দেয়। মদীনায় হিজরতের সময় হযরত যয়নবকে আক্রমণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী আক্রমণের আঘাতে বা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে গর্ভপাত হয়ে তার সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, তিনি প্রাণে বেঁচে মদীনায় এসে পৌঁছান। এর কিছুদিন পর আবুল আসও মুসলমান হয়ে যায় এবং হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ পর্যায়ে আমি দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। বর্তমানে **হামাস ও ইসরাঈলের মাঝে যুদ্ধ চলছে** যার ফলে এখন উভয় পক্ষের সাধারণ নিস্পাপ নাগরিকরা মারা যাচ্ছে। অথচ ইসলাম যুদ্ধাবস্থায়ও নারী, শিশু এবং যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ব্যতীত অন্যদের ওপর আক্রমণ করার অনুমতি দেয় না। মানুষ মনে করছে, হামাস যুদ্ধের আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু এটি দৃষ্টিপটে আনছে না যে, ইসরাঈলীরা এর পূর্বে কত নিস্পাপ মুসলমানকে হত্যা করেছে! তারপরও মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা উচিত। নারী, শিশুদের হত্যা করা ঠিক হচ্ছে না, কেননা তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে না। ইসরাঈলীরা যে কাজ করেছে তার প্রতিক্রিয়া অন্যভাবেও প্রকাশ করা যেত। যদি যুদ্ধ করা আবশ্যক হয়ে যায় তথাপি তা কেবলমাত্র যুদ্ববাজদের সাথে হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হামাস ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। হামাস যা করেছে এখন এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইসরাঈল ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। পশ্চিমাদেশগুলো তাদের ওপর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটি এখন আর থামবে না। তবে ইতিবাচক বিষয় এতটুকুই যে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কিছুটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে, এখানে মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে আর এমনটি করলে ভুল হবে। আসল বিষয় হলো, প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হলে এরূপ ঘটনা ঘটতই না। পরাশক্তিগুলো দ্বিমুখী আচরণ না করলে এরূপ অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগত না। এরা যুদ্ধ বন্ধ হোক এটি চায় না।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তারা **লীগ অব নেশনস** বানিয়েছিল। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার অভাবে এটি ব্যর্থ হয় আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে সাত কোটি মানুষ জীবন দিয়েছিল। এখন **জাতিসংঘ** গঠণ করা হয়েছে, কিন্তু তারাও তাদের লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলমান দেশগুলোর কমপক্ষে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। মহানবী

(সা.)-এর এ কথা তাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, **অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কেই সাহায্য করো।** আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতিগুলোকে বিবেক দিন তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায়প্রতিষ্ঠাকারী হয়। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোকেও বিবেক দিন তারা যেন বিশ্ববাসীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তাদের বোঝা উচিত, যদি ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় তাহলে পরাশক্তিগুলোও রক্ষা পাবে না। যাহোক, আমাদের অস্ত্র হলো দোয়া। তাই প্রত্যেক আহমদীর পূর্বের চেয়ে অধিক হারে এ বিষয়ে দোয়া করা উচিত। গাজায় কতিপয় আহমদী বন্দি আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এবং সকল নিস্পাপ নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন পৃথিবীকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পারি, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত, **ডাঃ বশীর আহমদ সাহেবের** হাযের জানাযা, যিনি ৯২বছর বয়সে সম্প্রতি লন্ডনে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মীর আহমদ সাহেব (রা.)'র দৌহিত্র ছিলেন। মরহুম নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। অত্যন্ত ধার্মিক ও আন্তরিক ছিলেন। তিনি ঘানার আহমদীয়া হাসপাতালে কিছুকাল সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যুক্তরাজ্যে আসার পর তিনি চতুর্থ খলীফা (রাহে.)'র খুতবা অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ করতেন। পবিত্র কুরআনকে অনেক ভালোবাসতেন। সন্তানদের পবিত্র কুরআনের অনুবাদও শেখাতেন। তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে বিভিন্ন কবিতা ও উদ্ধৃতি মুখস্থ করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও ছয় কন্যা রেখে গেছেন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **মুকাররমা ওয়াসীমা বেগম সাহেবার** যিনি ডাঃ শফিক সায়গল সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সায়গল নায়েব ওয়াকীলুত্ তাসনিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। মরহুমা শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ও তিন ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। সর্বদা কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন ওয়াকেফে যিন্দেগী। তাই বলতেন যে, খলীফার কথা অনুযায়ী ওয়াক্ফে যিন্দেগীর স্ত্রীও ওয়াক্ফে যিন্দেগী। দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সবাইকে ভালোবাসতেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয়ের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)